২১

কমিশনের সুপারিশমালা

গণমাধ্যমের মালিকানা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমের মালিকানার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং একক মালিকানা ও একাধিক গণমাধ্যমের মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কেন্দ্রীকরণের বিষয়গুলোয় সংস্কার শুরু হয়েছে। এমনকি দর্শক বা পাঠকের কত শতাংশ একটি গণমাধ্যমের গ্রাহক/ ভোক্তা, এর ভিত্তিতেও সেই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রকল্পের অনুমোদন বা আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। একক মালিকানার পরিবর্তে মালিকানা বিস্তৃত (diffusion of ownership) করার প্রয়োজনীয়তার কথা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন কমিশন তার প্রতিবেদনে বলেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় গণমাধ্যম চালু করার অধিকার দেশটির যে কোনো নাগরিকের রয়েছে; কিন্তু সেই গণমাধ্যমকে করপোরেশন হিসাবে কাজ করতে হয়, যার অর্থ হচ্ছে তা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হবে, যাতে সাধারণ মানুষও শেয়ার ধারণ করতে পারবে। একইসঙ্গে দেশটির মিডিয়া অ্যাক্টে সাংবাদিক-কর্মচারীদের শেয়ার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বেও অধিকাংশ বড় গণমাধ্যম কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির কারণে কোম্পানির উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপকদের শেয়ারহোল্ডারদের কাছে অন্তত জবাবদিহি করতে হয়।

তথ্যের সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস বা আস্থার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের আমানতের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ ব্যাংকের আমানতকে জনগণের আমানত বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হলেও আমাদের দেশে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তেমনটি করা হয়নি। ব্যাংকিং খাতে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্যোক্তা পরিচালক পারিবারিকভাবে ১০ শতাংশের বেশি শেয়ারধারণ করতে পারে না এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে একই সময়ে পরিবারের তিনজনের বেশি পরিচালক থাকতে পারেন না। কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রে তাই পরিবর্তন প্রয়োজন।

২১.১ কমিশন প্রথম পর্যায়ে মাঝারি ও বৃহৎ মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য শেয়ার ছাড়া ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সমীচীন মনে করছে। উদ্যোক্তা পরিচালক ও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ধারণের সীমা ২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত করা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে শেয়ারবণ্টন বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কর্মীদের শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমা পাঁচ শতাংশেই সীমিত রাখতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা কর্মীদের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন।

৩. ছোট আকারের মিডিয়া কোম্পানিতে কর্মীদের শেয়ার দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৪. একই কোম্পানি/গোষ্ঠী/ব্যক্তি/পরিবার/উদ্যোক্তা যাতে একই সঙ্গে একাধিক মাধ্যমের মালিক হতে না পারেন, সেজন্য বিশ্বের বহুদেশে ক্রস-ওনারশিপ (টেলিভিশনের মালিক সংবাদপত্রের মালিক হতে পারেন না, বা সংবাদপত্রের মালিক টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক হতে পারেন না) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও এটি আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটেনেও কাছাকাছি ধরনের এক আইনে টেলিভিশনের মালিক কোনো স্থানীয় পত্রিকায় ২০ শতাংশের বেশি শেয়ার ধারণ করতে পারেন না। ভারতে এ ধরনের একটি বিল পার্লামেন্টে বিতর্কের অপেক্ষায় আছে। আমাদের দেশেও বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়ার সময় এই মর্মে সিদ্ধান্ত ও প্রজ্ঞাপন হয়েছিল বলে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু

সাইয়িদ গণমাধ্যম কমিশনের কাছে পেশ করা লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন। তবে সেই প্রজ্ঞাপন মন্ত্রণালয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতই সরকারগুলো ওই নীতি অনুসরণ করেনি।

৩. বৈশ্বিক উত্তম চর্চা হচ্ছে গণমাধ্যমের কেন্দ্রীকরণ যেন কোনোভাবেই ঘটতে না পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ। কমিশন মনে করে, আমাদেরও অচিরেই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। ক্রস-ওনারশিপ নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারি করা যায় এবং যেসব ক্ষেত্রে এটি বিদ্যমান, সেগুলোয় পরিবর্তন আনার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাদের ব্যবসা পুনর্গঠনের লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া প্রয়োজন। এগুলো নানা পদ্ধতিতে হতে পারে। যেসব কোম্পানি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবার একই সঙ্গে টেলিভিশন ও পত্রিকার মালিক তারা যে কোনো একটি গণমাধ্যম রেখে অন্যগুলোর মালিকানা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করে দিতে পারে। অথবা দুইটি মিডিয়ার (টেলিভিশন ও পত্রিকাকে) সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী ও বড় আকারের একটি মিডিয়া (টেলিভিশন অথবা দৈনিক পত্রিকা) পরিচালনা করতে পারে।

৪. গণমাধ্যমে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে–এমন ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। একক মালিকানায় একই ভাষায় একাধিক দৈনিক পত্রিকা বা একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করে। সেই সাথে গণমাধ্যমের যে প্রভাবক ক্ষমতা, তা নিজ স্বার্থে কেন্দ্রীভূত করে। সে কারণে এই ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। বিদ্যমান এ ব্যবস্থার দ্রুততম সমাধান করতে হবে। একই সাবান একাধিক মোড়কে বাজারজাত করা যেমন বাজারের প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করে, একই মালিকানায় একই ভাষায় একাধিক দৈনিক পত্রিকাও গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করে এবং পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'এক উদ্যোক্তার একটি গণমাধ্যম (ওয়ান হাউজ, ওয়ান মিডিয়া)' নীতি কার্যকর করাই গণমাধ্যমে কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধের সেরা উপায়।

৫. গণমাধ্যমের মালিকানায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে মানুষ জেনেশুনে তার পছন্দ (ইনফর্মড চয়েজ) বেছে নিতে পারে। তাছাড়া এতে গণমাধ্যমে কালোটাকার অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর তার আর্থিক হিসাব উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে তার আয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

৬. সাংবাদিকদের ইউনিয়ন, সংঘ বা সমিতিগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীন। তবে সাংবাদিকদের ইউনিয়ন ছাড়াও নানা কারণ ও উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। একই জেলা বা উপজেলায় একাধিক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে বিভাগ ও এলাকাভিত্তিক সাংবাদিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু সংগঠন রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য ক্ষমতা তোষণে লিপ্ত বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ পটভূমিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি সাংবাদিকতা পেশার জন্য শুধু অপ্রীতিকরই নয়, বরং স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য বড় অন্তরায়। তাই ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য সংগঠনকে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অধিকার সরকার বা অন্য সব প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় কোনো সুযোগ-সুবিধা এসব সংঘ-সমিতির প্রাপ্য নয়। সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে।

৭. গণমাধ্যমের কলাম লেখক, প্রদায়ক শিল্পী ও অতিথি উপস্থাপক/আলোচকদের সম্মানির ওপর যে অগ্রিম কর নেওয়া হয়, তা সৃজনশীলতার ওপর করারোপের সমতুল্য। এই অগ্রিম কর রহত করা উচিত।

২১.২ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন

(প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের পরিবর্তে)

সব ধরনের গণমাধ্যমকে একই তদারকি বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ উঠে এসেছে অধিকাংশ মতবিনিময় সভায়। সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার জন্য বর্তমানে সচল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এবংসম্প্রচারমাধ্যম

ও অনলাইনের জন্য বিগত সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তার অভিজ্ঞতার আলোকেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার।

এটি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে। সরকারি অর্থের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থই হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে সরকার কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া। সেজন্যে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তাদের আয় থেকে নির্ধারিত হারে চাঁদা নির্ধারণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের সংস্থান করা যেতে পারে। ভারতের প্রেসকাউন্সিল প্রতিটি সংবাদপত্রের ওপর আনুপাতিক হারে লেভি আদায় করে থাকে। তারা সরকারের অনুদানও গ্রহণ করে। ইন্দোনেশিয়ায়ও মিডিয়া কাউন্সিল সরকারের সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তা নিঃশর্ত হতে হয়। বাংলাদেশেও প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনে সরকারি সহায়তা নেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত, তবে তা হতে হবে নিঃশর্ত অনুদান।

গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন যেসব দায়িত্ব পালন করবে তার মধ্য আছে:

ক. প্রকাশক ও সম্পাদকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ যাতে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত এবং ঋণখেলাপিরা গণমাধ্যমে মালিক/সম্পাদক না হতে পারে।

খ. সাংবাদিকতার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ

গ. সারাদেশে কর্মরত সাংবাদিকরা গণমাধ্যম কমিশনে নিবন্ধিত হবেন এবং কমিশন তাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করবে।

ঘ. সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণবিধি (কোড অব কন্ডাক্ট) প্রণয়ন করবে ও তার প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

ঙ. সম্প্রচার মাধ্যম (টিভি ও রেডিও) এবং অনলাইন পোর্টালের লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ ও তার শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

চ. ভুল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর অভিযোগের প্রতিকার। এটি সম্ভব হলে সংবাদমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হবে এবং গণমাধ্যম মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।

(প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা হলো।)

২১.৩ সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বিশ্বের উত্তম চর্চার কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোকে সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইনের একটি খসড়া অধ্যাদেশ আকারে এই রিপোর্ট সংযুক্ত করেছে এবং দ্রুতই এটি জারি করার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছে। এছাড়াও গত ১৫ বছরে বিভিন্ন আইনের অপপ্রয়োগের ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন বলে মনে করছে:

ক. দণ্ডবিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং আদালত অবমাননা আইনসহ প্রযোজ্য বিভিন্ন আইনের অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনার পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌঁসুলি কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার অথবা পুলিশ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ. পর্যালোচনা সাপেক্ষে মিথ্যা মামলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ও ন্যায়সংগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ঙ. সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও জীবনে বেআইনি অনুপ্রবেশ, নজরদারি ও আড়িপাতার ঘটনাগুলো তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২১.৪ সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য আইন সংস্কার

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন প্রয়োজন যাতে, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের বিষয়টি শুধু যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য হবে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে সংবিধানে আলাদা ও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন: সুইজারল্যান্ডের সংবিধানে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন না করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। সুইডেনের সংবিধানেও ফ্রিডম অব প্রেসের অনুরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংবিধানেও সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের মতো সাংবাদিকতার স্বাধীনতার গ্যারান্টির প্রশ্নটি সুনির্দিষ্টভাবে ও বিশদে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন।

২১.৪.১ ফৌজদারি মানহানি

ফৌজদারি মানহানির সব আইন, যেমন: ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ এবং ৫০২ ধারা এবং ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৯ ধারা বাতিল করা উচিত। সেই সঙ্গে সাংবাদিকদের মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের বিষয়টি নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনের ওপর প্রদান করার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ৯৯ক এবং ৯৯খ ধারায় সরকারকে সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (আইসিসিপিআর) পরিপন্থি। অতএব তা বাতিল করা উচিত।

২১.৪.২ সাইবার নিরাপত্তা আইন

প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের যেসব বিধান নিয়ে সাংবাদিক, অধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের উদ্বেগ রয়েছে, তা নিরসন করতে হবে।

২১.৪.৩ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩

৫ ধারা সংশোধন করে কেবল জাতীয় নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া উচিত এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য জনস্বার্থের প্রশ্নে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা সংযোজন করা উচিত।

২১.৪.৪ আদালত অবমাননা আইন

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (ICCPR) এর ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে ন্যায়বিচারের অধিকার এবং নির্দোষিতার স্বীকৃতি রক্ষার জন্য ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

খ. ২০১৩ সালের আদালত অবমাননা আইন (যা ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন বাতিল করেছিল এবং 'আদালতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা' অপরাধ পুনরায় প্রবর্তন করেছিল) বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে বিচারাধীন থাকা ২০২৩ সালের ১২৩৪নং দেওয়ানি আপিলের দ্রুত শুনানির জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

২১.৪.৫ বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত আইন

দণ্ডবিধির ২৯৫ক এবং ২৯৮ ধারা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৮ ধারা বাতিল করা উচিত।

২১.৪.৬ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইনের ৭নং ধারা সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতি রেখে ICCPR-এর ১৪, ১৯ এবং ২০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী করা উচিত, যাতে তথ্যাদি প্রকাশনার ফলে বিচারকার্য, জাতীয় নিরাপত্তা বা কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। কিন্তু জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক হলে এ বাধাগুলো অতিক্রম করার জন্য একটি 'ব্যতিক্রম (Exception)'-এর বিধান থাকা উচিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এমন একটি বিধানের সংযোজন করতে হবে, যাতে যখন জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ আবশ্যক হয়, বেসরকারি কোম্পানি এবং সংস্থা/এনজিওগুলোর কাছেও তথ্য অধিকারের আবেদন করা যায়।

তথ্য অধিকার আইনের ৬নং ধারা সংশোধন করে একটি নতুন বিধান সংযুক্ত করতে হবে। এই বিধান অনুযায়ী, তথ্য কমিশন প্রতিটি সরকারি কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রকাশনার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য প্রকাশনায় কতটা সফল হয়েছে, সে বিষয়ে লিখিত মতামত প্রদান করবে। এছাড়াও তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সব তথ্যের একটি উন্মুক্ত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার (Central Database) তৈরি করবে, যাতে ভবিষ্যতে জনগণ আলাদাভাবে আবেদন না করেই এই তথ্য পেতে পারে।

২১.৪.৭ তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ করা

বিটিআরএ-এর ৬৬ক ধারা এবং ৯৭ক ধারা (যা অজ্ঞাতনামা নিরাপত্তা সংস্থা এবং বিটিআরসি-কে নির্দেশ করে), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৪৬ ধারা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৮ ধারা সংশোধন করা উচিত, যাতে আধেয় অপসারণের সিদ্ধান্ত উপযুক্ত আদালতের অনুমোদন ছাড়া নিষিদ্ধ হয়।

২১.৪.৮ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪

এসব বিশেষণ বর্জন এবং 'দেশের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে বিকৃত' করে এমন বিষয়বস্তু এবং 'আইন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়'-এর মতো বিধিনিষেধের সীমা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (ICCPR) অনুযায়ী কেবল অনুমোদিত কারণেই সম্প্রচার সীমাবদ্ধ করা যাবে, তা নিশ্চিত করার জন্য এই বিধিনিষেধগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

২১.৪.৯ অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭

গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার জন্য, এই নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশনের ওপর এর তত্ত্বাবধান ও স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন।

২১.৫ বেসরকারি টেলিভিশনবিষয়ক সুপারিশসমূহ

২১.৫.১ বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর লাইসেন্সের আবেদন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র এবং লাইসেন্সধারীদের অঙ্গীকারনামা পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। এমনকি লাইসেন্স প্রাপকের কোনো পূর্বযোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা ছিল না। প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা এবং কিছুটা ব্যবসায়িক পরিচিতির ভিত্তিতেই এসব লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সরকারের 'বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালন নীতিমালা'য় ২.৬তে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সুষ্ঠু কার্যক্রম পর্যালোচনা করে নবায়ন করার কথা বলা আছে। এ পটভূমিতে গত দেড় দশকে প্রদত্ত সব লাইসেন্স পর্যালোচনার দাবি রাখে।

যেহেতু সম্প্রচার নীতিমালায় সম্প্রচার কমিশন গঠনের কথা বলা আছে এবং সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্ব সম্প্রচার কমিশনের, এবং যেহেতু গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গণমাধ্যমের সব বিষয়,

অর্থাৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইনের জন্য বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সমন্বয়ে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে, সেহেতু বেসরকারি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্সসমূহ পর্যালোচনার দায়িত্ব গণমাধ্যম কমিশনই পালন করবে।

২. গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক টেলিভিশনের রেটিং পয়েন্ট টিআরপি নির্ণয় ব্যবস্থা দ্রুতসময়ের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান টিআরপি ব্যবস্থায় যে অনিয়ম হয়েছে, এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মিথ্যা টিআরপি প্রচারের কারণে যেসব মিডিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণ চাইলে তাদের দাবি বিবেচনা করতে হবে।

৩. টিআরপি তদারকি কার্যক্রমে অ্যাটকো, দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ও বিজ্ঞাপন এজেন্সি থেকে একজন করে তিনজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। টিআরপি নির্ধারণ প্রক্রিয়া বেসরকারিভাবেও কোনো প্রতিষ্ঠান করতে চাইলে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তাদের টিআরপি ব্যবস্থা যথাযথ হচ্ছে কি না, সেটা তদারকি করবে গণমাধ্যম কমিশন।

৪. সরকারি কোনো ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে প্রচারের ক্ষেত্রে ফি প্রদান করতে হবে।

৫. সরকার কেবল অপারেটরদের এক বছরের সময় বেঁধে দিয়ে ডিজিটালাইজেশনের নির্দেশ দেবে, যাতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো রাজস্ব পেতে পারে।

৬. কেবল অপারেটরগুলো ডিজিটালাইজেশন হওয়ার আগ পর্যন্ত কেবল গ্রাহকের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে, এর ২৫ শতাংশ মাসিক ভিত্তিতে দেশে চালু চ্যানেলগুলোকে সমহারে বণ্টন করবে।

৭. আপ-লিংক এবং ডাউন-লিংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কেবল লিমিটেড (BSCL) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে দিতে হবে। কারণ এই BSCL-এর মাধ্যমে কোনো চ্যানেল বহির্বিশ্বে সম্প্রচার করতে পারছে না।

২১.৬ এফএম রেডিওর সুপারিশ

১. রেডিওর শ্রোতা কমে যাওয়া এবং বিজ্ঞাপন থেকে তার আয় নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ায় এফএম রেডিও সম্প্রচার অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রেডিওর গুরুত্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এফএম রেডিওর লাইসেন্সিংয়ে কিছু অযৌক্তিক বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলো তুলে দেওয়া উচিত। যেমন, লাইসেন্সের বিপরীতে সরকার যে জামানত রাখে, তা ফেরত দেওয়া এবং জামানত রাখার বিধান রহিত করা উচিত।

২. এফএম রেডিওতে বার্ষিক নবায়ন পদ্ধতি তুলে দেওয়া উচিত।

৩. এফএম রেডিওতে বাংলাদেশ বেতারের তদারকির ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত। তবে সম্প্রচারের মান এবং নীতিমালা বা কোড অব এথিক্স তদারকির কাজ গণমাধ্যম কমিশন করতে পারে।

৪. সরকারি ঘোষণা এফএম রেডিওতে প্রচার করতে হলে তাদের নির্ধারিত ফি দেওয়া উচিত।

৫. সরকারি বিজ্ঞাপন এফএম রেডিওতেও বরাদ্দ করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

২১.৭ অনলাইন পোর্টালের সুপারিশ

অনলাইন পোর্টাল একদিকে যেমন ব্যক্তি উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংবাদভিত্তিক পোর্টাল চালুর পথে উৎসাহিত করছে, তেমনই এর নিয়ন্ত্রণহীন ও বিশৃঙ্খল বিকাশ বা প্রসার ঘটছে। এই লাগামছাড়া বিস্তৃতি অনেকক্ষেত্রেই হলুদ সাংবাদিকতা, অনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিং, নাগরিক হয়রানি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে, তেমনইভাবে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য অস্বাভাবিক প্রতিকূলতা তৈরি করছে। বিগত সরকারের

অনলাইন নীতিমালা এক্ষেত্রে কার্যকর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই নীতিমালা পর্যালোচনা করে তা বাস্তবানুগ এবং কার্যোপযোগী করা প্রয়োজন। নিবন্ধনহীন পোর্টালগুলো বন্ধের জন্য হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা আছে। কিন্তু তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এ কারণে অনলাইন পোর্টাল কখন গণমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হবে, তা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি থাকা দরকার। গণমাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা একটি দৈনিক পত্রিকা বা সম্প্রচারমাধ্যমের সমপর্যায়ের হওয়া এবং তার অনুরূপ বিনিয়োগ সামর্থ্য নির্দিষ্ট করা না হলে এই বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে। বিগত সরকারের অনলাইন নীতিমালায় এই শর্তাবলি ঠিক করার দায়িত্ব প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের ওপর অর্পিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রচার কমিশন গঠন না করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তাদের মর্জি অনুযায়ী নিবন্ধন দিয়েছে, যাতে রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

১. অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধনের নীতিমালা হালনাগাদ করা এবং এর আলোকে নিবন্ধন প্রদানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা যেহেতু বিগত সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের ওপর ন্যস্ত ছিল, সেহেতু তা গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশনের ওপর অর্পণ করা সমীচীন।

২. গত দশকে যেসব অনলাইনে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে, তা যেহেতু কোনো স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট নীতির অধীনে হয়নি, বরং সরকারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে, সেহেতু সেগুলো পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ পর্যালোচনার দায়িত্ব স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা সমীচীন।

৩. অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধনের জন্য একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার যে তদন্ত ব্যবস্থা রয়েছে, তার অবসান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ডিক্লারেশনের জন্য বিদ্যমান পুলিশের তদন্তব্যবস্থাই যথেষ্ট গণ্য করা যায়।

৪. অনলাইন পোর্টালগুলো নিবন্ধন পাওয়ার পর তার বার্ষিক নবায়ন পদ্ধতি বাতিল করা হোক।

৫. অনলাইন নীতিমালায় আইপিটিভি এবং অনলাইন পোর্টালে সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার করা যাবে না–এমন নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা উচিত।

৬. অনলাইন পোর্টালে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার আলোকে সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. অনলাইন পোর্টালের জন্য ট্রেড লাইসেন্সের ফি সাধারণ ট্রেড লাইসেন্সের ফির কয়েক গুণ। এটি সংবাদমাধ্যমকে নিরুৎসাহিত করার নীতি। এর অবসান হওয়া উচিত।

২১.৮ বিটিভি, বেতার ও বাসস সম্পর্কে সুপারিশ

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গত সাড়ে তিন দশক ধরে যে জাতীয় ঐকমত্য রয়েছে, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রচারমাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন এবং বেতার এক ছাদের নিচে একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা হিসাবে কাজ করলে উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সর্বোত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিবিসি এবং ডয়েচে ভেলে। এটি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে সংবাদ ও সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠানমালার ক্ষেত্রে। ভিডিও ফরম্যাটে ধারণকৃত প্রতিবেদন/অনুষ্ঠানের অডিও ফরম্যাটকে আলাদা করা খুব কঠিন কিছু নয়। আবার বেতারের অনেক অনুষ্ঠানই এখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রচারের জন্য ভিডিও স্ট্রিমিং করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো তা নিয়মিতভাবে করছে। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে সহযোগিতার (কোলাবরেশন) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এখন সময়ের দাবি। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিটিভি এবং বেতার উভয়ের বার্তাকক্ষ মোটেও পেশাদার সাংবাদিকতার সঙ্গে পরিচিত নয়, বরং পুরোটাই সরকারি হ্যান্ডআউট, রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের খবর এবং উন্নয়ন বার্তা প্রচারে অভ্যস্ত। প্রধানত সরকারি তথ্য (সম্প্রচার) কর্মকর্তারা বার্তা বিভাগের নেতৃত্ব দেন এবং রিপোর্টার হিসাবে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ একেবারেই থাকে না।

বিপরীতে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি পেশাদার বার্তাকক্ষ রয়েছে। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণের কারণে সংস্থাটি আজ পর্যন্ত একটি আদর্শ বার্তা সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি। প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্টে সরকারের মালিকানায় কোনো বার্তা সংস্থা থাকা উচিত নয় বলে মতামত দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের বহু দেশেই কোনো রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা নেই। প্রথম প্রেস কমিশনের ওই রিপোর্টের ৪০ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়নি, বরং তা শুধু যে দল ক্ষমতায় আসে, সেই দলের অনুগত সাংবাদিকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক পরিসরেও এখন বার্তা সংস্থাগুলো আর প্রথাগত বার্তা সংস্থা নেই। তারা ভিডিও সাংবাদিকতা এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতির মানবিক বিষয়গুলোয় বেশি মনোযোগী হয়েছে। বাসসেও ভিডিও সাংবাদিকতার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১. এই বাস্তবতায় কমিশন মনে করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকিয়ে রাখার চেয়ে বাসসকে বিটিভি ও বেতারের নতুন সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের বার্তা বিভাগ হিসাবে একীভূত করাই হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। এই কেন্দ্রীয় বার্তা কক্ষের তৈরি খবর বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হবে। বিটিভি, বেতার ও বাসসের সমন্বয়ে সৃষ্ট নতুন প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা বা জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা নামকরণ করা যেতে পারে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ থাকবে–টেলিভিশন, বেতার ও বার্তা বিভাগ। নতুন সম্প্রচার সংস্থায় বার্তা বিভাগ তার বর্তমান গ্রাহকদের প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখবে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন করে পরিচালক থাকবেন এবং নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থার প্রধান হবেন একজন মহাপরিচালক।

২. সরকার বর্তমানে যেভাবে অর্থায়ন করছে, ঠিক সেভাবেই এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা নিজস্ব আয়ের পথও বের করবে। সরকার টেলিভিশন সেটের বার্ষিক লাইসেন্স ফি পুনঃপ্রবর্তনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

৩. এটি একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পর্ষদের চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক এবং তার বেতন-ভাতা পর্ষদ ঠিক করবে। সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানি পাবেন। এই পরিচালনা পর্ষদ জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে।

৪. বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের গঠন: পরিচালনা পর্ষদ হবে ৯ সদস্যের। তাদের মধ্যে থাকবেন:

- সম্প্রচারমাধ্যমে পরিচালনা/নেতৃত্ব দেওয়া দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন;
- সাংবাদিকতায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন।
- শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতে শীর্ষস্থানীয় একজন।
- শিক্ষাবিদ একজন।
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি একজন।
- একজন অর্থনীতিবিদ।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।
- বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থার মহাপরিচালক যিনি এই পর্ষদের সদস্য সচিব হিসেবে যুক্ত থাকবেন। সরকার মহাপরিচালক নিয়োগ দেবেন; কিন্তু তিনি পরিচালনা পর্ষদের কাছে জবাবদিহি করবেন।
- সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী ও একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হবেন।
- এ সদস্যরাই তাদের মধ্যে থেকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন /সভাপতি নির্বাচন করবেন।

- মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং সংস্থার মহাপরিচালক চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হবেন।
- এই পরিচালনা পর্ষদই সম্পাদকীয় নীতিমালা ঠিক করবে। পর্ষদই আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হবে।
- পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য মনোনীত হবেন। তবে একজন দুইবারের বেশি তার পদে থাকতে পারবেন না।

৫. পরিচালনা পর্ষদে মনোনয়নের জন্য একটি তিন সদস্যের বাছাই কমিটি হবে। একটি জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, বেসরকারি টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী এবং একজন শিক্ষাবিদ এই বাছাই কমিটির সদস্য হবেন। এ কমিটি পরিচালনা পর্ষদের ৬ জন সদস্যের বিপরীতে ১৮ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করবে। ওই প্রস্তাবনা থেকে সরকার পরিচালনা পর্ষদের জন্য ৬ জন সদস্য মনোনীত করবে।

৬. পরিচালনা পর্ষদ নতুন সংস্থার নিয়োগবিধি এবং নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

৭. বর্তমান জনবলের মধ্যে রেডিও ও বিটিভিতে কেউ যদি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে না থাকতে চান, তাহলে তাদের অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে আত্তীকরণ করা হবে। যারা একীভূত সম্প্রচার সংস্থায় চাকরিতে থাকবেন, তাদের সরকারি চাকরির সব সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে। কেউ স্বেচ্ছায় চাকরির অবসায়ন চাইলে তিনি নিয়মানুযায়ী সমস্ত পাওনা পাবেন।

৮. নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থা গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের আশু করণীয়:

    ক. নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি;

    খ. সম্প্রচার সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য বাছাই কমিটি গঠন;

    গ. বাছাই কমিটির সুপারিশের আলোকে নতুন একীভূত সংস্থার স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠন;

    ঘ. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধীনে চাকরি অব্যাহত রাখা বা সরকারের অন্য কোনো দপ্তরে আত্তীকরণের সুযোগ দেওয়া;

    ঙ. একীভূত নতুন সম্প্রচার সংস্থার অবকাঠামোর আধুনিকায়নে এককালীন বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

২১.৯ বাসস সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাব

কমিশন অবশ্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিষয়ে বিকল্প যে প্রস্তাব পেয়েছে, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। ওই প্রস্তাবেও বাসস সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হবে। কমিশন সদস্য সৈয়দ আবদাল আহমেদ ভারতের প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) মডেল অনুকরণে বাসসকে পুনর্গঠনের এই প্রস্তাবটি আলাদাভাবে সুপারিশমালায় অর্ন্তভুক্ত করার কথা বলেছেন।

১. সংবাদমাধ্যম মালিক (নোয়াব ও অ্যাটকো) ও সম্পাদকদের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ দুইজন), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রতিনিধি ও একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে, যার মধ্য থেকে ট্রাস্টিরাই একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। ট্রাস্টি এবং চেয়ারম্যানের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এবং কেউই পরপর দ্বিতীয় মেয়াদের যোগ্য হবেন না। এক মেয়াদে বিরতির পর পুনর্নির্বাচনের যোগ্য হবেন। বাসসের বর্তমান সম্পদের পুরোটাই অথবা অংশবিশেষ সরকার ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করবে। এই ট্রাস্ট তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. ট্রাস্ট সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে এবং সেই শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পদগুলো পূরণ করবে। সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের কাছে জবাবদিহি করবেন।

৩. ট্রাস্ট দ্রুততম সময়ে নিয়োগবিধি তৈরি করবে এবং তার ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের নিয়োগ যাচাই করবে। যারা যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে পারবেন না, তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে আবারও যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। দ্বিতীয়বারও কেউ যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার তাকে অন্য কোনো চাকরিতে আত্তীকরণ করবে। আর যারা বিকল্প চাকরিতে আগ্রহী নয়, তাদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধের পর চাকরির অবসায়ন ঘটবে।

২১.১০ সংবাদপত্রশিল্পের জন্য সুপারিশ

সংবাদপত্রশিল্পের সংকট যে বাড়ছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এর অনেকটাই সুস্থ ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণে। এই প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ অসংখ্য সুযোগসন্ধানী, অনিয়মিত ও নামমাত্র প্রকাশনা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলোর ঘোষিত সংখ্যা বিশ্বাস করতে হলে ঢাকা শহরের প্রতিটি দুধের শিশুকেও প্রতিদিন একটি করে দৈনিক পত্রিকা কিনতে হবে। দৈনিক এক কোটি ৫৩ লাখের বেশি কপি বাংলা পত্রিকা ঢাকায় বিতরণ হওয়ার এক অবাস্তব হিসাবের ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। ওই একই হিসাবে ঢাকায় দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা বিক্রি হয় ৬ লাখ ৮০ হাজার। ফলে প্রকৃত সম্ভাবনাময় পত্রিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর অবসান হওয়া দরকার।

১. সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা নিরীক্ষার সংস্কার করা জরুরি। বর্তমান ব্যবস্থায় দুর্নীতি হচ্ছে। মিডিয়া লিস্টভুক্ত হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে, তাতে ন্যূনতম প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ করা আছে। যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ক্ষেত্রে এটি ৬০০০, অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে ৪০০০ এবং অন্যান্য শহর থেকে ৩০০০। এটি প্রচারসংখ্যা না হয়ে বিক্রীত কপির সংখ্যা হওয়া উচিত, যা পরিশোধিত মূল্যের বিল যাচাইসাপেক্ষ হবে। ঢাকার বাইরে অর্থাৎ বিভাগীয় শহরে তিন হাজার ও জেলা শহরে একহাজার বিক্রীত কপি থাকলে তারা মিডিয়া তালিকাভুক্ত হবে।

২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মিডিয়া তালিকাভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা একই নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু বাস্তবে ইংরেজি পত্রিকার পাঠকসংখ্যা বাংলার তুলনায় খুবই সীমিত। কিন্তু দেশে তরুণদের মধ্যে ইংরেজির প্রসার এবং বিদেশিদের জন্য ইংরেজি পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি ইংরেজি পত্রিকায় দক্ষ জনশক্তির অভাবে উৎপাদন ব্যয় বেশি। তাই ইংরেজি পত্রিকার ক্ষেত্রে বিক্রীত পত্রিকার সংখ্যা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় শহরগুলোয় দুই হাজার কপি নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। অন্যান্য শহরেও এটি আনুপাতিক হারে কমানো যেতে পারে।

৩. পত্রিকা বিক্রির হিসাবে স্বচ্ছতার জন্য পত্রিকার বিক্রির সংখ্যা প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে পত্রিকা বিক্রির বিল আদায়ের রসিদ প্রদান আবশ্যক। এছাড়াও পত্রিকার রাজস্বের ওপর আয়কর রিটার্নের কপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৪. অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশনের মাধ্যমে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা যাচাইয়ের জন্য প্রেস ও অফিস পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা চালু আছে, ওই ব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সেজন্য এই পরিদর্শনে নাগরিক সমাজের অন্তত তিনজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করতে হবে। এ তিনজন মনোনীত হবেন গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনপেশায় অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞাপন এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে। এসব প্রতিনিধির কেউ দুই বা তিন বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এবং তাদের সম্মানি সরকার নির্ধারণ করবে।

৫. গত ১০ বছর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার বাড়েনি। হার বা রেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং বাজারের মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞাপনের হার বার্ষিক ভিত্তিতে বাড়ানো উচিত। বিজ্ঞাপনের মূল্যহার নির্ধারণে যে আলাদা শ্রেণিকরণ আছে, তা পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং আনুপাতিক হারে তার সামঞ্জস্যকরণ সমীচীন।

৬. সরকারি বিজ্ঞাপনের রেট বেসরকারি বিজ্ঞাপনের রেটের তুলনায় নগণ্য। এ বৈষম্য কমাতে সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্যহার বর্তমান বাজারভিত্তিক করা প্রয়োজন।

৭. আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পত্রিকাগুলোয় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। স্থানীয় সম্প্রদায়/কমিউনিটির জনগণের জন্য প্রযোজ্য এমন তথ্যসংবলিত বিজ্ঞাপন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আঞ্চলিক/স্থানীয় পত্রিকায় দিতে হবে।

৮. সংবাদপত্রে অগ্রিম আয়করের নামে একধরনের অঘোষিত কর আরোপ করা হয়েছে। কেননা অগ্রিম আয়কর প্রতিবছরের প্রদেয় করের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় না। সংবাদপত্রশিল্পে আরোপিত সব ধরনের অগ্রিম কর বাতিল করা সমীচীন।

৯. সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত করপোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার (২৭.৫ শতাংশ) প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্প খাতের মধ্যে এই করপোরেট করহার সর্বোচ্চ। তৈরি পোশাকশিল্পে এই হার ১৫ শতাংশ। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিরীক্ষাকৃত হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি করপূর্ব সামান্য মুনাফা করলেও কর পরিশোধের পর তা বড় ধরনের লোকসান করছে। করপোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার এবং অগ্রিম কর আদায়ের ধারা অব্যাহত থাকলে অনেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটি শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তোলার পথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক এবং তা অচিরেই অপসারণ করা উচিত।

১০. সংবাদপত্রশিল্পের জন্য নিউজপ্রিন্ট আমদানিতে শুল্কারোপ বন্ধের কথা বিবেচনা করা উচিত।

১১. সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কাছে পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ পাওনা দ্রুত পরিশোধ করা প্রয়োজন।

১২. ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণে বাংলা পত্রিকার সঙ্গে প্রচারসংখ্যা তুলনীয় নয়। তাই ইংরেজি পত্রিকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিজ্ঞাপনের মূল্যহার যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন।

১৩. গণমাধ্যমের জন্য সহজ শর্তে, ন্যূনতম সুদে ঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. জনস্বার্থে অলাভজনক (Non-Profit) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সব ধরনের কর ছাড় দিয়ে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা করবে, তা ব্যাধতামূলকবভাবে পুনর্বিনিয়োগ করবে।

২১.১১ বিজ্ঞাপনের মান ও বিজ্ঞাপন বণ্টনে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমের আবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা যখন ক্রমেই কথিত নিউ মিডিয়ামুখী হচ্ছে, বাংলাদেশে তখনো প্রথাগত গণমাধ্যম বা লিগ্যাসি মিডিয়ার প্রসারণ চলমান। ফলে বিজ্ঞাপন পাওয়ার প্রতিযোগিতা এক অসুস্থ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দাম কমানোর প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞাপনদাতারা লাভবান হচ্ছেন। আবার এই সংকটে বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর মধ্যেও প্রতিযোগিতায় যোগসাজশের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা থাকছে না। কমিশন অংশীজনদের মতামতের আলোকে মনে করে:

ক. অচিরেই বিজ্ঞাপনের মান ও প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি তদারকি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন মান কর্তৃপক্ষ (অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

খ. এই প্রতিষ্ঠান হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ সংস্থা।

গ. এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও বিভিন্ন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন নীতিমালা তৈরি করবে, যা বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সিসমূহ এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমগুলোর জন্য অবশ্যপালনীয় হবে।

ঘ. পিআর এজেন্সি ও মিডিয়া বায়িংয়ের মতো বিষয়গুলোয়ও স্বচ্ছ নীতিমালা ও আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালন নিশ্চিত করবে এ কর্তৃপক্ষ।

ঙ. টেলিভিশনের রেটিং-ব্যবস্থা টিআরপি নির্ধারণ এবং সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা যাচাইয়ের পরিদর্শনব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর সংগঠন, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন এ সম্পর্কে আলাদা সুপারিশ করেছে।

চ. বিজ্ঞাপনশিল্পে কোনো ধরনের যোগসাজশ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিপন্থি কৌশল চর্চা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত অনুষ্ঠান সমীচীন হবে। প্রতিযোগিতা কমিশন এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারে।

২১.১২ সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন সম্পর্কিত সুপারিশ

গণমাধ্যমের সংখ্যাধিক্য ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারত্বের পটভূমিতে সাংবাদিকতা পেশায় বেতন-ভাতা ক্রমেই কমছে বা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে, যেখানে প্রাপ্য বিভিন্ন ভাতা বাদ পড়ছে এবং চাকরির স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অথচ জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ছাড়া সাংবাদিকতায় আপসকামিতা ও দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থি। এ ধরনের অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক ও স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তোষণবাদী হতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। এ পরিস্থিতির অবসানে সব সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল, বেতার ও অনলাইনমাধ্যমের সাংবাদিক ও অন্য সংবাদকর্মীদের জন্য যেসব পদক্ষেপ আবশ্যক:

১. কোনো গণমাধ্যম নিয়োগপত্র ও ছবিসহ পরিচয়পত্র ছাড়া এবং বিনা বেতনে কোনো সাংবাদিককে অস্থায়ী, স্থায়ী কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করতে পারবে না।

২. সাংবাদিকদের শিক্ষানবিশ চাকরির মেয়াদ এক বছরের অধিক হবে না। এক্ষেত্রে তাকে সম্মানজনক শিক্ষানবিশ ভাতা প্রধান করতে হবে।

৩. সারা দেশের সাংবাদিকদের স্থায়ী চাকরির শুরুতে একটি অভিন্ন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা হবে সরকারি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মূল বেতনের সমান। ঢাকায় জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বেশি হওয়ার দরুন ঢাকায় নিয়োজিত সাংবাদিকরা মূল বেতনের সঙ্গে 'ঢাকা ভাতা' (অ্যালাউন্স) প্রাপ্য হবেন। তিন বছর সংবাদদাতা (রিটেইনার) হিসেবে কাজ করার পর ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা নিজস্ব প্রতিবেদক (স্টাফ করেসপনডেন্ট) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করবেন। ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদার এই বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টেও বলা আছে।

৪. মূল বেতনের বাইরে সাংবাদিকরা বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব ভাতা, ঝুঁকি ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অবসর ভাতা কিংবা গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হবেন।

৫. প্রতিবছরের শুরুতে পূর্ব বছরের গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকদের বেতন বৃদ্ধি হবে। অন্যান্য ভাতার ক্ষেত্রেও অন্তত দুই বছর পরপর মূল্যস্ফীতি সামঞ্জস্য করে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

৬. ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের জন্য আলাদা একটি নিয়োগ বিধি এবং একটি ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

- অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে কাজ করানো যাবে না।

৭. কোনো গণমাধ্যমে সাংবাদিককে সার্কুলেশন তদারকি এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।

৮. কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অব সার্ভিসেস অ্যাক্ট) ১৯৭৩ এবং শ্রম আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আলোকচিত্রী/ভিডিও সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবে।

১০. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সব সাংবাদিকের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে। পেশাগত কারণে যেকোনো মামলা-মোকদ্দমা নিরসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আইনি সহায়তা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. গণমাধ্যমের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (সাংবাদিক নন) বর্তমানে যে হারে বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হন, তা সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে (ratio অনুসারে) বৃদ্ধি পাবে।

২১.১৩ পিআইবি ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সুপারিশ

১. যেহেতু আধেয় (কন্টেন্ট) তৈরির ক্ষেত্রে সব ধরনের গণমাধ্যম এখন মাল্টিমিডিয়ানির্ভর হয়ে পড়ছে, সেহেতু গণমাধ্যমের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে একীভূত করা সমীচীন মনে করেছে সংস্কার কমিশন। একীভূত করা হলে তা একটি শক্তিশালী জাতীয় গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হবে।

২. প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (জাগই)-কে একটি একক পরিচালনা পর্ষদের অধীনে পরিচালনা করা গেলে কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে এই একীভূত প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. এই একীভূত প্রতিষ্ঠানটির জন্য স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ স্বাধীন অবকাঠামোর ব্যবস্থা (নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) করতে হবে।

৪. বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান দুইটির অবকাঠামো, জনবল এবং সম্পদ নতুন প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলে যাবে।

৬. নতুন প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যমশিল্পে কী ধরনের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তা জরিপের মাধ্যমে নিরূপণ করে প্রশিক্ষণসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।

৭. গণমাধ্যমের স্বার্থে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা হবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান কাজ।

৮. বিদ্যমান লাইব্রেরিকে আধুনিকায়ন করে সেটিকে গণমাধ্যমশিল্পের জন্য ব্যবহারযোগ্য রেফারেন্স কেন্দ্রে পরিণত করা হবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ।

২১.১৪ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সুপারিশ

সাংবাদিকতার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যত কোনো সম্পর্ক নেই। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্মাণের বিষয়ে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও চলচ্চিত্রের জন্য তার প্রাসঙ্গিকতা বেশি। চলচ্চিত্র কার্যত কেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে না হয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, কমিশন এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। তাই কমিশন মনে করে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় কি না, তা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে।

২১.১৫ ভুয়া/অপতথ্য মোকাবিলায় সুপারিশ

১. প্রতিটি বার্তা কক্ষে অপ/ভুয়া তথ্য যাচাইয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত সাংবাদিকরাই এ কাজটি করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। সংবাদমাধ্যমের আর্থিক সংকটের কারণে সত্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রমে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সংকট মোকাবিলায় সংবাদশিল্পে বৃহত্তর ও সম্মিলিত উদ্যোগের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবা যেতে পারে। অবশ্যই এই উদ্যোগের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২. বৃহৎ প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলো, যেমন গুগল, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। ফলে ওইসব প্ল্যাটফর্মে অপ/ ভুয়া তথ্য চিহ্নিত হওয়ামাত্র তাদের সজাগ করা এবং তথ্য যাচাই ও অনুসন্ধানে সহায়তা দিয়ে দ্রুত সেগুলো

অপসারণ ও প্রচারিত কুতথ্য/ অপতথ্য/গুজব, বিভ্রান্তি নিরসন সম্ভব হবে। ভুয়া তথ্য, অপ বা কুতথ্য প্রচারের জন্য এসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় অঙ্কের জরিমানার বিধান এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধির নজির এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

৩. ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, তাদের সহায়তা নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সক্রিয় হয়েছে, যাদের সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য প্রচারের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিও বাংলাদেশে ফ্যাক্ট চেকিংয়ে নিয়োজিত হওয়ার নজির রয়েছে। এ কারণে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

৪. ভুয়া/অপ তথ্য মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন করা এবং বিভিন্ন কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে তারা প্রতিটি তথ্য যাচাইয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ও গুরুত্ব আরোপ করে।

২১.১৬ গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে সুপারিশ

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের (সমমানের মাদ্রাসাসহ) গণমাধ্যম সাক্ষরতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং সেশনের আয়োজন করা যেতে পারে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ের গবেষক ও চিন্তকদের এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান/এনজিও এবং একাডেমিয়ার মিলিত উদ্যোগে এ কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।

২. শিক্ষার্থীরা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, বয়স এবং ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা মানুষের গণমাধ্যম সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য বিনামূল্যে অনলাইনে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। এ নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার ও ক্যাম্পেইন চালাতে হবে। এ কাজে মোবাইল ফোনে বার্তা প্রেরণ থেকে শুরু করে সব ধরনের মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (যেমন, পিছিয়ে থাকা নারী, গ্রামের অধিবাসী, সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী) এ ব্যাপারে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবেন।

৩. উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত যোগাযোগ কমকর্তাদের প্রশিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে পারেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ের (পাড়া, মহল্লা, এলাকা) সামাজিক সংগঠনগুলোকে (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব) সক্রিয় করতে হবে। এদের মাধ্যমে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিটি এলাকার বিভিন্ন বয়সি মানুষের জন্য গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক আলোচনা এবং শিক্ষাবিনোদন (এডুটেইনমেন্ট) মডেলে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৬. গণমাধ্যম সাক্ষরতার পদ্ধতি, ফলপ্রসূকরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে আরও গবেষণালব্ধ-জ্ঞান প্রয়োজন।

৭. এ বিষয়ে গবেষণা আরও বাড়াতে গবেষণাকর্মে প্রণোদনাদানের জন্য সরকার উদ্যোগ নিতে পারে।

২১.১৭ গণমাধ্যমে জেন্ডার ও সমতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সুপারিশ

সমাজে একটি জেন্ডার-সাম্যমূলক পরিবেশ তৈরির অংশ হিসেবে গণমাধ্যমে জেন্ডার-সাম্যের বিষয়টিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোয় মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে:

ক. গণমাধ্যমের সব পর্যায়ে সব জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ, পদায়ন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা;

খ. প্রতিটি গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণবিধি প্রস্তুত করতে হবে এবং আচরণবিধি কার্যকরভাবে পালনের জন্য তথ্যদান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রাখা; সব জেন্ডারের সাবলীল অংশগ্রহণের জন্য অবকাঠামো (যেমন: ভিন্ন টয়লেট, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র) ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;

গ. নারীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে জেন্ডার নির্বিশেষে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতার ব্যবস্থা; নিরাপদে যাতায়াতের জন্য পরিবহনব্যবস্থা রাখা;

ঘ. হাইকোর্ট প্রণীত যৌন নিপীড়ন রোধ নির্দেশ (২০০৯) অনুযায়ী প্রতিটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার সেল তৈরি করা;

ঙ. সাংবাদিকতায় নানা ধরনের চাপ মোকাবিলায় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া;

চ. নারী যেন যথাযথভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় এবং ছুটি শেষে কাজে ফিরে কোনো বৈষম্যের মুখোমুখি না হয়, তা নিশ্চিত করা;

ছ. নারীকে কীভাবে উপস্থাপনা করা হবে, তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং নিয়মাবলি রচনা করা; নারীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে, কিংবা সব ক্ষেত্রে তার সাবলীল পদচারণায় বাধা সৃষ্টি করে–এমন গৎবাঁধা ধারণা প্রকাশ ও প্রচার না করার বিষয়ে নীতিমালা প্রস্তুত করা;

জ. সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ও অংশগ্রহণ তুলে ধরা; কোনো একটি সংবাদ/ফিচারের ক্ষেত্রে নারীর কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে কি না, তা খেয়াল রাখা;

ঝ. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করা, যাতে শব্দ বা বর্ণনার মাধ্যমে নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবমাননা না হয়।

২১.১৮ আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি সম্পর্কিত সুপারিশ

গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারে:

১. গণমাধ্যম নীতিমালায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্তি;

২. গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম সম্প্রচার সময়সীমা নির্ধারণ;

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকাশ/প্রচাররত গণমাধ্যমে আদিবাসী ভাষায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;

৪. আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে যেসব মাধ্যম গড়ে উঠেছে, তাদের নিবন্ধন সহজতর করা; এছাড়া আদিবাসীদের নিজস্ব গণমাধ্যম যেন আরও গড়ে উঠতে পারে, তার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া;

৫. মূলধারার গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থাপন যথাযথ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ উপস্থাপনের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা;

৬. সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে 'আদিবাসী বিষয়' (Indegenous Studies) অন্তর্ভুক্ত করা;

৭. আদিবাসী সাংবাদিক/সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ দেওয়া ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

২১.১৯ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বিষয়ে সুপারিশ

গণমাধ্যমকে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে শুধু প্রতিবেদন প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে, কনটেন্ট তৈরিতে এবং নীতিমালায় সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। যেভাবে তা করা যেতে পারে:

- চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো স্ক্রিন রিডার-সহায়ক ও সহজ ভাষায় লেখা; সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা (যেমন: ইশারা ভাষার দোভাষী, নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি) নিশ্চিত করা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রযোজক ও প্রযুক্তিগত পদে নিয়োগ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মেন্টরশিপ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রবেশগম্য অফিস (র‍্যাম্প, লিফট, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব বাথরুম) নিশ্চিত করা;
- সহায়ক প্রযুক্তির (স্ক্রিন রিডার, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার) ব্যবস্থা করা।
- ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং আওয়ারস এবং রিমোট ওয়ার্ক সুবিধা দেওয়া।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধু করুণা বা অনুপ্রেরণার বস্তু হিসেবে না দেখিয়ে তাদের সক্ষমতা ও অবদানের গল্প তুলে ধরা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, আলোচক ও প্যানেলিস্ট হিসেবে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করা।
- টেলিভিশন সংবাদে ক্লোজড ক্যাপশন ও ইশারা ভাষার দোভাষী যুক্ত করা; রেডিও প্রোগ্রামের জন্য লিখিত ট্রান্সক্রিপ্ট বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য অডিও বিবরণী দেওয়া;
- অনলাইন সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সহজ ভাষা, অল্ট টেক্সট, ইমেজ ডিসক্রিপশন ও ব্রেইল-সহায়ক ফরম্যাট ব্যবহার করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় সম্মানজনক ভাষা ব্যবহারের নির্দেশিকা থাকা।
- ওয়েবসাইটগুলো যেন ওয়েব কনটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন (WCAG 2.1) অনুসারে ডিজাইন করা হয়; স্ক্রিন-রিডার সক্ষম নিউজ অ্যাপ তৈরি করা; অডিও, ব্রেইল ও বড় ফন্টে সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

২১.২০ সংবাদে উপস্থাপনের ধরন ও পাঠক-দর্শকদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুপারিশ

গণমাধ্যমের প্রকাশিত যেকোনো ধরনের আধেয় (কন্টেন্ট) পাঠকের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, এর ওপর প্রতিটি গণমাধ্যমের নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা, বয়স, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের ওপর তার প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।